জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার উপেক্ষা করে, দেশীয় অংশীদারদের বাদ দিয়ে জাপানি বিশেষজ্ঞদের তৈরি, বাংলাদেশের জাতীয় পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য সর্বনাশা

সমন্বিত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা বাতিল করুন

জাতীয় মালিকানায় দেশিয় বিশেষজ্ঞদের নিয়ে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করুন

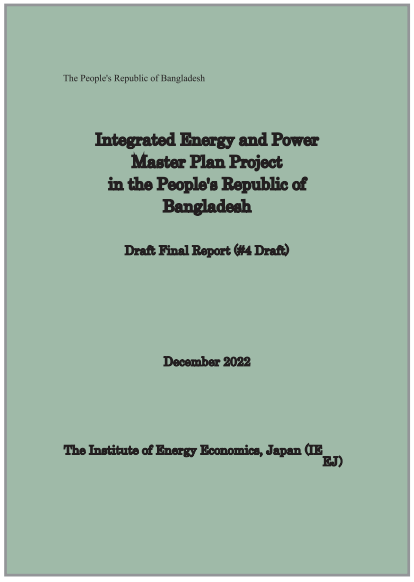

জাইকা ও আইইইজে প্রস্তাবিত
সমন্বিত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা

- মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা-বিরোধী
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার-বিরোধী
- প্রযুক্তিগতভাবে অনির্ভরযোগ্য
- পরিবেশের জন্য ধ্বংসাত্মক
- অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিকর

প্রকাশক

Coastal Livelihood and Environmental Action Network
clean

bwged

জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (জাইকা)'র সহযোগিতায় ইনস্টিটিউট অব এনার্জি ইকোনোমিক্স, জাপান (আইইইজে) বাংলাদেশর জন্য সমন্বিত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা (আইইপিএমপি) প্রণয়ন করছে। এর আগে ২০১০ ও ২০১৬ সালেও জাইকার সহায়তায় বিদ্যুৎ খাত বিষয়ক মহাপরিকল্পনা (পিএসএমপি) প্রণয়ন করা হয়েছিল। এগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল আমদানি-নির্ভর কয়লা ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি)। করোনা-পরবর্তী অর্থনৈতিক সংকটে এখন বাংলাদেশ গুরুতরভাবে আমদানিকৃত জ্বালানির ঘাটতিতে ভুগছে। বিদ্যুৎকেন্দ্র থাকলেও জ্বালানির অভাবে সেগুলো চালানো যাচ্ছে না। ফলে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ করেও বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান করা যাচ্ছে না। নবায়নযোগ্য জ্বালানি, বিশেষ করে সৌর ও বায়ুবিদ্যুতে বিনিয়োগ করলে বর্তমান সংকট এতটা গভীর হতো না।

আইইপিএমপি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চরম ঘাটতি রয়েছে। জাইকা বা বাংলাদেশ সরকার— কোনো পক্ষই এই প্রকল্পের বাজেট ও কার্যক্রম প্রকাশ করেনি। জাপানের কারিগরী সহায়তার অধীনে গোপনে জাপানি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে জাইকা এই কাজ করছে যা ওইসিডিভূক্ত দেশ হিশেবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

শুধুমাত্র ৪৭ জন জাপানি বিশেষজ্ঞ এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন; বাংলাদেশের একজনকেও এতে যুক্ত করা হয়নি। এটা তৈরিতে জাইকা বা আইইইজে বাংলাদেশের কোথাও কোনো পরামর্শ সভার আয়োজন করেনি; জ্বালানি ও বিদ্যুতের ভোক্তা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, আবাসিক গ্রাহক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদক, জেন্ডার কর্মী বা তরুণদেরকে এটার প্রণয়ন প্রক্রিয়া থেকে পুরোপুরি বাইরে রাখা হয়েছে। এমনকি জাতীয় সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বিশেষ করে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি; পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং তথ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকেও এ বিষয়ে অন্ধকারে রাখা হয়েছে। আইইইজে কয়েকজন নাগরিক প্রতিনিধি নিয়ে দুটি পরামর্শ সভা ও একটি প্রচার সভার আয়োজন করলেও নাগরিকদের মতামত ব্যক্ত করার জন্য খুবই সামান্য সময় দেয়া হয়। তারপরও নাগরিকগণ যেসব মতামত দিয়েছেন খসড়া আইইপিএমতে সেগুলো পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়েছে।

আগের পিএসএমপিতে অতিরিক্ত চাহিদা প্রাক্কলন করার কারণে সরকার তড়িঘড়ি করে ব্যাপকসংখ্যক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের অনুমোদন দেয় যা এই খাতে অতি-সক্ষমতা তৈরি করেছে। দেশের বর্তমান সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা ১৫,৬৪৮ মেগাওয়াট (১৯ এপ্রিল ২০২৩), কিন্তু গ্রীড-সংযুক্ত সক্ষমতা ২৪,১৪৩ মেগাওয়াট (১৫ মে ২০২৩)। ফলে, সারা বছর ৮,৪৯৫ মেগাওয়াট সক্ষমতার বিদ্যুৎকেন্দ্র অলস বসে থাকে যা মোট চাহিদার ৫৪.৩ শতাংশ। এসব অলস বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে ২০০৭-০৮ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ১,৩২,২৬৮.২০ কোটি টাকা (১৬ বিলিয়ন ডলার) ক্যাপাসিটি চার্জ (সক্ষমতা পারিতোষিক) দিতে হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সক্ষমতা পারিতোষিকের পরিমাণ হবে প্রায় ২৩,০০০ কোটি টাকা (২.১২ বিলিয়ন ডলার)।

আইইপিএমপি'র চতুর্থ খসড়ায় (ডিসেম্বর ২০২২) ২০৫০ সাল নাগাদ দেশের মোট বিদ্যুতের চাহিদা ৯৭,০০০ মেগাওয়াট থেকে ১,১১,১১৪ মোগাওয়াট হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে যা জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের মতে অতিরঞ্জিত। এ অতিরঞ্জিত প্রাক্কলন অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়নের পর আবারও বিপুল অঙ্কের সক্ষমতা পারিতোষিকের ফাঁদে পড়তে হতে পারে।

২০৪১ সালে মধ্যে জলবায়ু-সহিষ্ণু উচ্চআয়ের দেশে পরিণত হবার লক্ষ্য নিয়ে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা' গ্রহণ করে। এর আলোকে ওই বছরই ডিসেম্বরে জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিশ্চিত করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। ২০২৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রীপরিষদ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য

অনুমোদন দেয়। এতে বাংলাদেশে ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ, ২০৪১ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ এবং ২০৫০ সালের মধ্যে শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করা হয়েছে।

'মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা'র লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে আইইপিএমপি প্রকল্পের লক্ষ্য হলো : একটি স্বল্প বা শূন্য নির্গমনকারী জ্বালানি চাহিদা ও সরবরাহের ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা জ্বালানি-নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং অর্থনৈতিকভাবে টেকসই হবে। আইইপিএমপি'র উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে : বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়নের অভিযাত্রায় স্বল্প নির্গমনকারী বা কার্বন-নিরপেক্ষ সমাজের গঠনের জন্য নীতিকাঠামো ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে স্বল্প বা শূন্য-কার্বন জ্বালানি চাহিদা ও সরবরাহ-ব্যবস্থা স্থাপন করা।

কিন্তু প্রস্তাবিত আইইপিএমপির চতুর্থ খসড়া তৈরি করা হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার বিরুদ্ধে গিয়ে। এই খসড়ায় ২০৪১ সালের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ তথাকথিত 'পরিচ্ছন্ন জ্বালানি'র লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। 'পরিচ্ছন্ন জ্বালানি'র আওতায় 'উন্নততর প্রযুক্তি'র নামে আমদানি-নির্ভর অনির্ভরযোগ্য তরল হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া ও কার্বন সংরক্ষণ প্রযুক্তি প্রবর্তনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে যা দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এছাড়া খসড়া পরিকল্পনায় ২০৫০ সাল নাগাদ ৩০.৭% জীবাশ্ম জ্বালানি (প্রধানত কয়লা ও এলএনজি), ৩২.৮% তথাকথিত 'উন্নততর প্রযুক্তি' এবং মাত্র ১৭.১% নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়েছে।

এর মানে হলো বগলে ইট, মুখে শেখ ফরিদ। আইইএমপি প্রকল্পের লক্ষ্যের জ্বালানির লক্ষ্যমাত্রা পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। জীবাশ্ম জ্বালানি ও অপরীক্ষিত প্রযুক্তি কখনও 'শূন্য কার্বন' নির্গমনকারী হতে পারে না; এসব এমনকি 'জ্বালানি নিরাপত্তা' দূরে থাকুক, 'টেকসই অর্থনীতি'ও নিশ্চিত করতে পারে না। উচ্চমাত্রায় দূষণকারী কয়লা ও এলএনজি স্থানীয় পরিবেশ ও জনসাধারণের জীবন-জীবিকার উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এছাড়াও অতিকষ্টে উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক অস্থির বাজার থেকে ব্যয়বহুল কয়লা ও এলএনজি কিনে বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করতে হয়।

যে কোনো জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য সরকারকে বৈদেশিক মুদ্রায় সক্ষমতা পারিতোষিক পরিশোধ করতে হয়। অতিরিক্ত সক্ষমতা পারিতোষিক বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। উল্লেখ্য যে, নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র 'নো ইলেকট্রিসিটি নো পে' নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়; তাই কোনো ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হয় না।

আইইএমপি'র খসড়ায় আরো প্রস্তাব করা হয়েছে যে, ২০৩৫ সাল থেকে কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্রের সঙ্গে ২০ শতাংশ অ্যামোনিয়া, ২০৩৭ সাল থেকে গ্যাস-বিদ্যুৎকেন্দ্রের সঙ্গে ২০ শতাংশ হাইড্রোজেন, ২০৪০ সাল থেকে হাইড্রোজেনভিত্তিক নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং একই বছর থেকে কার্বন-সংরক্ষণ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। এখন পর্যন্ত এই প্রযুক্তিগুলোর কার্যকারিতা পরীক্ষিত নয়। এমনকি কানাডা, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাজ্যের মতো উন্নত দেশগুলোও জাপানের এ প্রযুক্তি নিতে অস্বীকার করেছে। দ্বিতীয়ত, এই প্রযুক্তির মাধ্যমে জীবাশ্ম জ্বালানি-ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মেয়াদ বাড়বে যা বাংলাদেশকে চরম অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখে ফেলবে। তৃতীয়ত, এই প্রযুক্তি ব্যবহার করলে বিদ্যুতের দাম যে তিনগুণ বেড়ে যাবে তা আইইপিএমপি'র খসড়াতেই বলা হয়েছে। চতুর্থত, এই প্রযুক্তি গ্রহণ করলে প্রযুক্তি প্রস্তুতকারী দেশগুলোর উপর বাংলাদেশ আরো নির্ভরশীল হয়ে পড়বে।

আইইপিএমপি'র সবশেষ খসড়া অনুসারে ২০৫০ সাল নাগাদ ২৬,২৩০ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হবে যার মাত্র ২৭ শতাংশ সৌরবিদ্যুৎ। কিন্তু বাংলাদেশের 'টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ' প্রণীত 'সৌরশক্তি পরিকল্পনা'র খসড়া অনুসারে ২০৪১ সাল নাগাদ ২৫,০০০ থেকে ৪০,০০০ মেগাওয়াট সৌর-বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা বাংলাদেশে রয়েছে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি পরীক্ষাগারের গবেষণা প্রতিবেদন অনুসারে বাংলাদেশ কমপক্ষে ৩০ হাজার মেগাওয়াট বায়ু-বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব।

উল্লেখ্য, জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের দাম প্রতিবছর গড়ে ১২% হারে বাড়ছে। অপরদিকে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের দাম কমে যাচ্ছে ১০% হারে। বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরে ডিজেল থেকে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ হয় ৩৬.৬১ টাকা, ফার্নেস অয়েলে ১৬.৮৬ টাকা এবং কয়লায় ১৩.৪০ টাকা। অপরদিকে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ হয় ১৩.৩০ টাকা যা বিগত ৫ বছর আগে ১৯.৪০ টাকা ছিল। সাম্প্রতিক চুক্তিতে প্রতি ইউনিট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন-খরচ ধরা হয়েছে ৭.৯০ টাকা।

নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের স্থাপন খরচও দ্রুত কমে এসেছে। প্রতি মেগাওয়াট কয়লা ও গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে খরচ হয় যথাক্রমে ১৫.৯৮ কোটি টাকা (১.৪৮ মিলিয়ন ডলার) ও ৮.৪২ কোটি টাকা (০.৭৮ মিলিয়ন ডলার)। অন্যদিকে ১ মেগাওয়াট ক্ষমতার সৌর-বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে খরচ হয় মাত্র ৬.৮৩ কোটি টাকা (০.৬৩ মিলিয়ন ডলার) যা প্রতিবছর গড়ে ১০% হারে কমে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, বিশেষজ্ঞদের মতে কেবলমাত্র ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রদেয় সক্ষমতা পারিতোষিকের ২৩,০০০ কোটি টাকা টাকায় বাংলাদেশ ২০ বছরের জন্য প্রায় সাড়ে ৩ হাজার মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ তৈরি করতে পারে অতিরিক্ত আর কোনো খরচ ছাড়াই।

তাই, বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০৪১-র অধীনে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, জ্বালানি নিরাপত্তা ও নিরাপদ পরিবেশ সংরক্ষণে বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমাদের জোর দাবি —

- জাইকার অর্থায়নে জাপানি প্রতিষ্ঠান আইইইজে প্রণীত বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী খসড়া আইইএমপি অবিলম্বে বাতিল করুন;
- 'মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা'র আলোকে ২০৫০ সাল নাগাদ শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানি বাস্তবায়নের জন্য সৌর ও বায়ুবিদ্যুতে প্রাধান্য দিয়ে দেশজ মালিকানায় দেশের নীতি নির্ধারক ও বিশেষজ্ঞসহ সকল অংশীদারকে নিয়ে সমন্বিত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করুন।

বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের উন্নয়ন অংশীদার জাপানের প্রতি আমাদের অনুরোধ, জাপানি কোম্পানি ও তাদের প্রযুক্তি চাপিয়ে না দিয়ে বাংলাদেশের নিজস্ব উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করুন।

যোগাযোগ

bwged

bwged.bd@gmail.com | bwged.blogspot.com